আচ্ছে দিন দূর অস্ত

মৈত্রীশ ঘটক

১

ভারতের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রমনিয়ানকে সম্প্রতি প্রশ্ন করা হয়েছিল, ২০১৪-১৫ সালের ইকোনমিক সার্ভে-র উচ্ছ্বসিত আর আশাবাদী সুরটা বর্তমান শেষ অর্থবর্ষের সার্ভে-তে এসে এমন রূঢ় বাস্তববাণীতে পর্যবসিত হল কেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, "এরকম হয়"।

কিন্তু হলটা কী?

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসেছিলেন অর্থনৈতিক বিকাশের নবযুগ আনার প্রতিশ্রুতিতে ভর করে। একটা উন্নয়নশীল দেশ, যার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ২৮-এর কম বয়সী, তাদের আশা-আকাংক্ষা খুব স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল মোদীর ২০১৪ সালের স্লোগানে – "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ"। ইউপিএ-র মেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারে ভাঁটা পড়া ঘিরে হতাশা, এবং জনমানসে দেশের শীর্ষে শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাববোধ তৈরি হওয়া – এই দুইয়ের বিকল্প হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে এক মুশকিল-আসান প্রবল-পরাক্রমী নেতা আর তাঁর 'গুজরাট মডেলে'র মধ্যে এক স্বপ্নের অমরাবতীর আভাস পেয়েছিলেন ভোটাররা। আমরা যারা তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে গুজরাট মডেল নিয়ে প্রচার আর বাস্তবের মধ্যে একটা বিশাল ফারাক আছে সেটা দেখিয়েছিলাম, তাদের কথা রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট বা অপ্রিয় সত্য বলে অগ্রাহ্য করা হয় ।[1] আসলে ভারতের কর্পোরেট দুনিয়া, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, এমন কি আপামর জনসাধারণের একটি অংশ বড়ই অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, ও সার্বিক পরিবেশ নিয়ে । নেহরু জমানার বাম-ঘেঁষা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে আস্থা হারিয়ে এক ধাক্কায় উন্নত দেশগুলোর সাথে টক্কর দেবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁরা মনে করলেন একজন শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন যিনি রাতারাতি ভারতকে চীন বানিয়ে দেবেন । কিন্তু প্রচার আর বাস্তব তো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, 'আচ্ছে দিন' শব্দবন্ধটা আর তেমন আলোচনায় উঠে আসছে না, 'গুজরাট মডেল', 'মোদীন মিক্স '-ও না। আর্থিক বৃদ্ধির হার দুই অঙ্কে পৌঁছনো বা অর্থনৈতিক দিক থেকে চিনকে টেক্কা দেওয়ার দাবিগুলো নিয়ে তো আরোই কিছু বলার নেই । সরকারী পরিসংখ্যানে যথেচ্ছ মশলা ফোড়ন দিয়েও অর্থনৈতিক নিশ্চলতার বাসি গন্ধ চাপা পড়ছে না । একদিকে ধর্ষণ, খুন, দাঙ্গা, গণপ্রহারে হত্যা আর অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদের উচ্চকিত হুঙ্কার আর বিভেদের রাজনীতিতে জাতীয় সংহতি শতচ্ছিন্ন প্রায় -- এমতাবস্থায় মোদীর 'বিকাশে'র দামামা ফাটা ঢাকের মত শোনাচ্ছে ।

ইন্টারন্যাশনাল মানেটরি ফান্ড বা আইএমএফ থেকে প্রকাশিত ভবিষ্যতের বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস যদি দেখা যায়, ২০১১ ও ২০১২ সালে দাঁড়িয়ে তারা ২০১৬ ও ২০১৭ সালের জন্য বৃদ্ধির হারের যে পূর্বাভাস দিয়েছিল, বাস্তবে

সেই হার অনেকটা কম হয়ে দাঁড়ায় ।[2] তাদের সবচেয়ে সাম্প্রতিক রিপোর্টে গত বছরে দেওয়া পূর্বাভাসও সংশোধন করে খানিক নামানো হয় । আবার এদিকে আগের জমানার সাথে মোদীর জমানায় ভারতীয় অর্থনীতির হাল তুলনা করার উপায় এত দিন ছিল না, কারণ ২০১৪ সালে নতুন সরকার আসার পরে পরেই সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকাল অর্গানাইজেশন (সিএসও) ভারতের জাতীয় আয় মাপার বেস ইয়ার বা ভিত্তি বৎসর হঠাৎ ২০০৪-০৫ থেকে বদলে ২০১১-১২ করে দেয়। বেস ইয়ার দরকার হয় আয়বৃদ্ধির হারকে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবমুক্ত করার জন্যে – গোড়ার দিকের কোন বছরের মূল্য-সূচক দিয়ে পরের বছরগুলোর আয়কে মাপলে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সরিয়ে বাস্তবে কতটা আয় বেড়েছে বোঝা যায় । এমনিতে বেস ইয়ার পাল্টালে অসুবিধে নেই, যদি আগে ও পরের সব বছরের পরিসংখ্যান তার নিরিখে পেশ করা হয় । কিন্তু, এই নতুন বেস ইয়ারের নিরিখে ২০১১-১২ সালের আগের বছরগুলোর পরিসংখ্যান নতুন করে পেশ করা হয়নি, আবার ২০১১-১২ সালের পরের পরিসংখ্যানও পুরনো বেস ইয়ারের (২০০৪-০৫) নিরিখে ফেলা হয়নি। তার ফল হয়েছিল এই যে ২০১১-১২ সালের আগের আর পরের বছরগুলোর আয়বৃদ্ধির হারের মধ্যে ঠিক করে তুলনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সিএসও-র একটি সাব-কমিটি সম্প্রতি যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে, তাতে নতুন হিসেবে বিগত বছরগুলির আর্থিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে এ বার। তবে, এই পরিসংখ্যান সরকার মানবে কি না, রীতিমত সংশয় তা নিয়ে। পরিসংখ্যান যা বলছে, সেটা নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে সুখবর নয়। দেখা যাচ্ছে, ইউপিএ-র মোট দশ বছরের শাসন কালে গড় আর্থিক বৃদ্ধির হার বছরে ৮.১ শতাংশ। আর, মোদী সরকারের ক্ষেত্রে সেই হার ৭.৩%। এমনকি, দ্বিতীয় ইউপিএ-র আমলে, যখন নাকি কেন্দ্রীয় সরকার নীতিপঙ্গুত্বে ভুগছিল, বছরে গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৪%। মোদী জমানার চেয়ে সামান্য হলেও বেশি। তাহলে ‘অচ্ছে দিন’ কোথায় গেল? এমনকি, যে বাজপেয়ী আমলের বৃদ্ধির হার নিয়ে স্মৃতিমেদুরতার শেষ নেই— মনমোহন সিংহ ক্ষমতায় এসে যে বৃদ্ধির সর্বনাশ করেছিলেন বলে প্রচার— সেই আমলে বৃদ্ধির বাৎসরিক গড় হার ছিল ৫.৮%।

বৃদ্ধির হারের এই শ্লথগতি নিয়ে ভাগ্যের দিকে আঙুল তুললে কিন্তু চিঁড়ে ভিজবে না । দ্বিতীয় ইউপিএ-এর শেষ বছরগুলির সঙ্গে (২০১১-২০১৪) যদি তুলনা করা যায়, ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে আর্থিক বৃদ্ধির হার সার্বিক ভাবে কিছুটা হলেও বেড়েছে । দ্বিতীয় ইউপিএ-র আমলে, যখন ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার তুলনায় কম ছিল, তখন গোটা দুনিয়ার গড় বৃদ্ধির হারের চেয়ে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫.২৬ শতাংশ-বিন্দু বেশি ছিল, যা মোদীর আমলে কমে হয়েছে ৪.৪৮ শতাংশ-বিন্দু । আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অনেকটা পড়েছে মনমোহন সিংহ জমানার তুলনায়, ফলে সরকারের ঘরে কর রাজস্ব বেড়েছে অনেকটাই; আর কৃষিক্ষেত্রেও খরা বা বন্যার মত কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত উৎপাদনে ঘাটতি হয়নি, যা খাদ্যাভাব আর মূল্যস্ফীতির কারণ হতে পারত । বৃদ্ধি ও সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুকূল হাওয়া থাকা সত্ত্বেও, নোটবন্দি এবং জিএসটি রূপায়ণে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার অন্তত এক শতাংশ বিন্দু কমিয়ে এনেছে । আর এই হিসেবটাও কমিয়ে ধরা; কারণ অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই নীতিগুলোর প্রভাব কতটা গভীর ভাবে পড়েছে তার প্রকৃত ছবি জাতীয় আয়ের সরকারি পরিসংখ্যানে ধরা পড়া কার্যত অসম্ভব।

২

দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আবশ্যক কারণ বৃদ্ধি থেকে হয় কর্মসংস্থান এবং মজুরির হারের বৃদ্ধি, আর বর্ধিত জাতীয় আয়ের থেকে যে কররাজস্বের বৃদ্ধি হয় তার থেকে পরিকাঠামো, সামাজিক ক্ষেত্রে ও কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগের অর্থসমাগম হয়। তাই আর্থিক বৃদ্ধির হার হলো আচ্ছে দিন মাপার প্রথম ধাপ । কিন্তু শুধুমাত্র আর্থিক বৃদ্ধির হারের মন্দগতি থেকে এই ক'বছরে দেশের দরিদ্র জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান কি হয়েছে তার সম্পূর্ণ মলিন ছবিটা পুরোপুরি উঠে আসে না। দেশের সাধারণ মানুষ ঠিক কতটা অর্থনৈতিক সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন তার সঠিক চিত্রটা ঠিকমত ফুটে ওঠে না। অক্সফ্যাম –এর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট বলছে, গত বছর ভারতের জনসংখ্যার ধনীতম ১% মানুষ জাতীয় সম্পদের মোট বৃদ্ধির ৭৩% করায়ত্ত করেছে, যেখানে জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশের ভাগ হলো মাত্র ১%।[3] কোম্পানির মুনাফার ভাগ বেশি পেতে গেলে যেমন পুঁজির মালিকানা বেশ হতে হয়, সেই রকম আগে থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ ও পুঁজি না থাকলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার আপনার জীবনযাত্রার মানে তেমন কোনও উন্নতি আনবে না । কথাটা খুব সোজা – চূড়ান্ত অসম একটা অর্থনীতিতে আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষীর কখনওই পিছিয়ে পড়া জনগণের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চুঁইয়ে পড়ে না। তার প্রমাণ তো কর্মসংস্থান আর মজুরিবৃদ্ধির হার আর শেয়ার বাজারে সেনসেক্সের বৃদ্ধির হার তুলনা করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে ।

লুকাস শঁতেল-এর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে লেখা একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে *Capital in the 21st Century* বইটির লেখক প্রখ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ তোমা পিকেটি নজর দিয়েছেন ভারতে সম্পদের অসাম্যের দিকে ।[4] আয়কর সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে গৃহভিত্তিক সমীক্ষা আর জাতীয় তহবিলের খতিয়ান মিলিয়ে, ১৯২২ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের আয়কর চালু করার সময় থেকে শুরু করে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের আয়গত অসাম্যের সালতামামি তৈরি করেছেন পিকেটি ও শঁতেল । পরিমাপ-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে সরিয়ে রাখলে এই সমীক্ষা থেকে মূল যে সিদ্ধান্তটিতে তাঁরা পৌঁছচ্ছেন তা হল এই : জাতীয় আয়ে অতি-বিত্তবানদের ভাগ ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে টানা নীচের দিকে গেছে, আশির দশকের গোড়ার দিক থেকে ফের বাড়তে শুরু করেছে, এবং ২০১৪ সালে অর্থাৎ তাঁদের সমীক্ষার শেষ বছরে একেবারে রেকর্ড উচ্চতায় এসে পৌঁছেছে। অন্যদিকে জনসংখ্যার হতদরিদ্র অংশ অথবা বণ্টনের মাপকাঠিতে যাঁরা মাঝামাঝি পড়বেন এই দুই শ্রেণীর ক্ষেত্রে একই সময়কালের মধ্যে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা।

এ বার, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হয় মূলত মজুরি ও বেতন এবং (স্থাবর বা অস্থাবর) সম্পদের থেকে আয় বৃদ্ধি পেলে। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির যে সুফল তাকে আরও সুষম ভাবে বণ্টন করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর আয়ের বৃদ্ধির হার উঁচু থাকতে হবে। ভারতের মত শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশে সেটা হওয়া কঠিন। শ্রমিক আয়ের বৃদ্ধির হার সঠিক ভাবে পরিমাপ করা মুশকিল, তবে একাধিক রিপোর্টে ইঙ্গিত যে বাস্তবে এ দেশে মজুরি বৃদ্ধির হার জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারের থেকে কম, এমনকি সংগঠিত বেসরকারী ক্ষেত্রেও । কৃষি তথা অসংগঠিত ক্ষেত্রের মজুরি এবং বেতনের বৃদ্ধির অবস্থা কী রকম হতে পারে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।

অর্থাৎ, অর্থনীতির বৃদ্ধির হারের যে মন্দার কথা বলে এ বছরের ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্ট শুরু হচ্ছে, তা আপাত ভাবে দেশের জনসংখ্যার যে অংশটি দরিদ্র নয় তাদের আয় বৃদ্ধিতে মন্দার কথাই বলে শুধু; দরিদ্র জনসংখ্যার জীবনযাপনের মান কতটা পড়ছে বা কোথায় থমকে আছে তার প্রতিফলন আদৌ ঘটায় না। ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের এক বছর আগে মোদী সরকারকে এই নির্মম অর্থনৈতিক বাস্তবটির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাই এবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কিছু কল্যাণমূলক খাতে সরকার ব্যয় বাড়িয়েছে । একে আর্থিক-সংস্কারপন্থীরা 'জনমোহিনী নীতি' বলে উড়িয়ে দিলেও, দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যাকে দীর্ঘমেয়াদে সুদিনের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার নিদান দেওয়াটা না রাজনৈতিক ভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য, আর না ন্যায়বিচারের নিক্তিতে স্বীকার্য।

গণতন্ত্রে একটা মানুষ মানে একটা ভোট, কিন্তু অর্থনীতির আঙ্গিনায় এক জন মানুষের প্রভাব বা প্রতিপত্তি নির্ভর করে তার সম্পদের পরিমাণের উপর। বিত্তশালীদের ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় দেশে কোন কোন পণ্য উৎপাদন হবে। আর দেশে কোন কোন নীতি গৃহীত হচ্ছে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে বিত্তবান গোষ্ঠীগুলি নিজেদের সুযোগ-সুবিধার জন্য তদবির করতে কতটা পারদর্শী তার উপর। জনমোহিনী ছকে পড়ে নীতি নির্ধারণ দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে, সেটা ঠিক। যেমন, প্রতিটি নির্বাচনের আগে আগে ঝুলি উজাড় করে খরচ করা আর উদার হাতে ঋণ দেওয়া দুটোতেই সরকারের লাভ আছে। তার মাশুল গুনতে হয় পরে, মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে। কিন্তু অন্যদিকে, ধনীদের আরও আরও পাইয়ে দেওয়ার নীতি, যাকে পোশাকি ভাষায় 'elite capture' বলা হয়ে থাকে, সেটাও অত্যন্ত সমস্যাজনক। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের খরচ যে পথে ওঠে, সেটিই হল সরকার গঠন হবার পর নীতি নির্ধারণের উপর বিত্তশালীদের এমন বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ থাকার মূল কারণ। সেভিংস্ অ্যাকাউন্টের সুদ বা বেতনের উপর কর বসছে, অথচ বড় পুঁজির মুনাফায় কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে, এমন বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা আর কীই বা হতে পারে? বৃহৎ পুঁজির সংস্থাগুলিকে নানা খাতে কর ছাড়ের সুবিধা দিয়ে ছোট ব্যবসাগুলির ঘাড়ে প্রকৃত অর্থে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি করের হার চাপিয়ে দেওয়ার নীতির ব্যাখ্যাই বা কী? মোট কথা, বিত্তের উপর সরাসরি কর চাপাতে সরকারের এত দোনামোনার পিছনে যুক্তিটা কী?

সরকারের কাজকর্মের পিছনে নিহিত উদ্দেশ্যগুলিকে 'জনমোহিনী' বলে উড়িয়ে দিলে আসলে মূল সমস্যাটাকেই অগ্রাহ্য করা হয়। যে কোনও গণতন্ত্রেই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হল, এ তো নতুন বোতলে পুরনো মদ্য (বা, গোমূত্র) - তাহলে মোদী নতুন কি করলেন ?

৩

এক নামজাদা রাজনীতিক একবার বলেছিলেন, প্রচার পদ্যে চলে, কিন্তু প্রশাসন চলে গদ্যে। সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তার সঙ্গে সারা দেশের আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা পূরণ করা মোদী সরকারের সামনে বরাবরই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তাছাড়া, যে কোনও আর্থিক সংস্কার রূপায়ণের ক্ষেত্রেই এক দল সুবিধা পায় এবং আরেক দল অসুবিধায় পড়ে, ফলে কিছু অংশের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়াটাও একরকম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু

পরিসংখ্যানের কড়া গদ্যে যে ছবিটা উঠে আসছে, তা আর্থিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে ক্ষমতায় আসা কোনও সরকারের পক্ষে একটু বেশিই হতাশাব্যঞ্জক।

লাইসেন্স-কন্ট্রোল রাজের যে সব অবশিষ্টাংশ আজও আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসে আছে, সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে কিছু কড়া সিদ্ধান্ত খুবই সময়োপযোগী হত। এক্ষেত্রে কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের নাম পালটে নীতি আয়োগ রাখা ছাড়া আর কোনও রকম রাজনৈতিক সদিচ্ছার চিহ্নমাত্র দেখায়নি সরকার|

সরকারের অপরাধ দ্বিবিধ। কাজ না করার, এবং কাজ করার।

প্রথমে, কাজ না করা। সংস্কারের দিক থেকে দেখলে, একটিও বড়সড় অপব্যয়ী নীতির সংস্কার (যেমন জ্বালানি ও সার সহ এমন সব ভর্তুকি যাতে মূলত লাভবান হন অপেক্ষাকৃতভাবে বিত্তবান শ্রেণী বা পেটোয়া কর্পোরেটদের জলের দরে জমি বা লাইসেন্স দেওয়া), বা প্রশাসনিক লালফিতার ফাঁস আলগা করা অথবা উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনও উপাদানের বাজার সংক্রান্ত নীতির সংস্কার (যেমন জমি অধিগ্রহণ বা শ্রমিক আইনের জটিলতা কমানো) কোনটাই এই সরকার করে উঠতে পারেনি। বিলগ্নিকরণের সমস্যাটাই ধরা যাক। গত জুনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলেও এয়ার ইন্ডিয়ার শেয়ার বিক্রি এখনও দূর অস্ত; নানা সংবাদ সংস্থার রিপোর্টে বলা হচ্ছে, "সরকার চায় না এয়ার ইন্ডিয়া কর্মীদের চাকরি চলে যাক।" জনসমক্ষে প্রধানমন্ত্রীর যে চেহারাটা তুলে ধরা হয় – মার্গারেট থ্যাচার-লি কুয়ান ইউ-ডেং জিয়াওপিং ধাঁচের দৃঢ়চেতা, বলিষ্ঠ, প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হননা এমন একজন নেতা – তার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তহীনতা মোটেই খাপ খায় না।

দ্বিতীয়ত, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কিছু কাজ করা। বিমুদ্রাকরণ এবং জিএসটির মত নীতিগুলিকে তড়িঘড়ি বহাল করে দেওয়ার ফলে যে সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা সরকারের মুখ পুড়িয়েছে; বিশেষত তাদের সংস্কার-ভাবনার যে অন্যতম স্তম্ভ, সেই 'কালো টাকা' ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি নিয়েই জনমানসে ভালো রকম উদ্বেগ আর অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। ভারতের বিনিয়োগের হার ২০১১-১২ সালের ৩৯% থেকে ২০১৫-১৬ সালে ৩৩%-এ নেমে আসার পিছনে নিঃসন্দেহে এই উদ্বেগের ভূমিকা রয়েছে। দুর্নীতি হটানো খুবই মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের মত বিশাল দেশে আর্থিক সংস্কারের ভিত্তি শুধু সেইটুকুই হতে পারে না। আর তা যদি হতও , তার জন্যে মশা মারতে কামান দাগার মত অপরিণামদর্শী বিমুদ্রাকরণ নীতি সর্বৈব ভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল - সাম্প্রতিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় সব কালো টাকাই আবার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার "ঘরে" ফিরেছে|

আধার প্রকল্প যেভাবে প্রায় সামরিক কায়দায় জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে এই ব্যাপারটার একটা যোগসূত্র আছে। সরকার দেশের জনকল্যাণ যোজনাগুলিতে দুর্নীতি এবং অপচয় রুখতে চাইছে, ভালো কথা। কিন্তু তার বিনিময়ে ইউআইডি-তে প্রযুক্তিগত সমস্যার দোহাই দিয়ে যদি দেশের সবচেয়ে দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষদেরকে র‍্যাশন এবং পেনশন তুলতে বাধা দেওয়া হয়, সেটা তো কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য নয়| এমনিতেই সমাজের প্রান্তভাগে কোনওমতে টিঁকে আছেন যাঁরা, আধার তাঁদের কাছে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে উঠেছে।

আমাদের প্রশাসনিক পরিকাঠামোর যে বেহাল দশা, তাতে করে সবাইকে, এমনকি যাঁরা কোনও সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন না তাঁদেরও এক ধাক্কায় আধারের অধীনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত কোনওমতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। জন-ধন যোজনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও সেই একই গা-জোয়ারি কায়দার প্রতিফলন; এদের মধ্যে বহু অ্যাকাউন্টেই ব্যালেন্স ১ টাকা, শুধুমাত্র নমো নমো করে 'জিরো ব্যালেন্স' তকমাটি ঘুচিয়ে নিয়ে সরকারি লক্ষ্যমাত্রার হিসেব মেলানো ছাড়া এদের আর কোনও কাজ নেই।

নতুন প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বিমা যোজনাটি এর আগে 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা'র (RSBY) ব্যর্থতা থেকে কোনও শিক্ষাই নেয়নি বলেই মনে হচ্ছে। আর তাছাড়া যোজনায় তত্ত্বাবধান এবং দায়ভার বণ্টনের একটা যথাযথ কাঠামো আগে থেকে তৈরি না থাকলে নতুন যোজনাও যে তার পূর্বসূরির পথেই যাবে সেটা তো মোটামুটি স্পষ্ট – বাজেটে বড়সড় অঙ্কের ঘাটতি তৈরি হবে, বেসরকারি বিমা সংস্থা এবং হাসপাতালগুলির মুনাফা লোটার সহজ রাস্তা খুলে যাবে, এবং সর্বোপরি যে জনগণের জন্য যোজনা তাদের লাভের খাতা সেই শূন্যই থেকে যাবে।

৪

একমাত্র যে ক্ষেত্রে মোদী সরকার সংস্কারের জন্যে খানিকটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে তা হলো অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্যে কিছু প্রয়োজনীয় নীতির প্রণয়ন। [5] এর জন্যে অনেকটা কৃতিত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের প্রাপ্য। ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঝুড়ি ঝুড়ি অলাভজনক সম্পদ বা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট-এর (NPA) ভারে জর্জরিত। যে সব ঋণ কোনও দিনই শোধ হবে না কারণ সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংক কর্মীদের সাহায্য নিয়ে ব্যবসায়ীদের তরফে সংগঠিত চুরি ছাড়া কিছুই নয়, সেগুলোকেই নরম করে পোশাকি ভাষায় এনপিএ বলা হয় আরকি। রিজার্ভ ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা রিপোর্টে (ডিসেম্বর ২০১৭) বলা হচ্ছে ব্যাংকের তাবৎ সম্পত্তির ১০.২% বর্তমানে এনপিএ; এছাড়াও যে সব সম্পত্তিকে 'রুগ্ন' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে (যা প্রকৃত অর্থে এনপিএ-ই) তাদের পরিমাণ ১২.৮%-এ দাঁড়িয়ে। সব মিলিয়ে এই পরিমাণ ব্যাংকের মোট সম্পদের এক চতুর্থাংশে দাঁড়ায়, এবং সেটাও পুরো হিসেব নয় বলেই ধরা হচ্ছে। অত্যন্ত তৎপরতার সাথে যে এই সমস্যাটির মোকাবিলা করা প্রয়োজন তা নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর থাকাকালীন নানা পদক্ষেপ নেওয়া রঘুরাম রাজনের অন্যতম অবদান।

এনপিএ নিয়ে নীতির পার্শ্বিক প্রয়োগের ফলেই সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বারবার ভুল কারণে শিরোনামে উঠে আসছে। জনৈক হীরা ব্যবসায়ী, যিনি আবার আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সমপদবীধারীও বটে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ১১,৭০০ কোটি টাকার ঋণ খেলাপ করে চুপচাপ দেশান্তরী হয়েছেন সম্প্রতি। এর সঙ্গে আরেক দেশান্তরী (এবং বড়ই রঙিন চরিত্রের) ব্যবসায়ীর ৮,৫০০ কোটির ঋণখেলাপি জুড়লে অঙ্কটা সরকারের স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের দুই তৃতীয়াংশের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। এবং এটাও হিমশৈলের চূড়ামাত্র, পুরো ছবিটা এখনও অন্ধকারে। সম্প্রতি রাজন মন্তব্য করেছেন, যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অনাদায়ী ঋণের জন্যে দায়ী রাঘববোয়ালদের একটি তালিকা পেশ করেছিলেন, তা নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি অবহিত নন। [6]

যে কোনও বড় কেলেঙ্কারির পরে যেমন হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবেই আমূল সংস্কারের জন্য দাবি উঠতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বলছেন সরকারি ব্যাংকগুলির (যা কিনা গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার ৭০%) বেসরকারিকরণ করতে হবে, আবার কেউ বলছেন যথাযথ প্রশাসনিক সংস্কার এনে ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক দল-ব্যাংক আধিকারিকের দুষ্টচক্রটি থেকে সরকারি ব্যাংকগুলিকে সুরক্ষিত করা হোক।

এইভাবে দেখলে, বেসরকারিকরণ অনিবার্য সমাধান বলেই মনে হয়, কিন্তু সেটা করা ভুল হবে, মূলত দু'টি কারণে।

প্রথমত, ভারতে বেসরকারি ক্ষেত্রটি একেবারেই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান রজনীশ কুমার সম্প্রতি দেখিয়েছেন, দেউলিয়া মামলার জন্য যে সব ঋণখেলাপি সংস্থাকে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালে পাঠানো হয়, তারা সাধারণত সবাই বেসরকারি সংস্থা। মোট ঋণের ৫৬% যায় বড় ঋণগ্রহীতাদের খাতে, কিন্তু মোট এনপিএ-তে তাদের অবদান (৮৩%) তুলনায় অনেকটা বেশি। আর বেসরকারি ব্যাংক এবং অর্থলগ্নি সংস্থাদের আর্থিক কেলেঙ্কারির সংখ্যাও কিছু কম নয়। তাছাড়া, তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মোট সম্পদে এনপিএ-র অনুপাত ৯.৬%, যা সরকারি ব্যাংকের অনুপাতটির (১২.৫%) থেকে আদৌ খুব একটা পিছিয়ে নেই।

দ্বিতীয়ত, গ্রামগঞ্জে, যেখানে কিনা দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি ভারতীয় এখনও বসবাস করেন, সরকারি ব্যাংকগুলির উপস্থিতি বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি। সেটা আশ্চর্যের নয় – বেসরকারি ক্ষেত্র মুনাফার গন্ধ না থাকলে যাবে না, কাজেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হয় সেই সরকারি ব্যাংকগুলিকেই।

তার উপর, অপেক্ষাকৃত গরিব ঋণগ্রহীতারা, যেমন ছোট চাষিরা (যাঁদের একটা বিরাট অংশ সম্প্রতি মুম্বই শহরে মিছিল করে গেছিলেন তাঁদের ভয়াবহ অর্থকষ্টের নালিশ জানাতে), মূলত নির্ভর করেন অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতা, যেমন মহাজনদের উপর। রাজ্য সরকারগুলি নিয়মিত কোটি কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুব করে বটে, কিন্তু এগুলো সবই প্রথাগত ব্যাংক ঋণ; যে গরিব চাষিরা মহাজনদের উপর নির্ভরশীল তাঁদের এতে কোনও সাহায্য হয় না। সর্বভারতীয় ঋণ ও লগ্নি সমীক্ষার (২০১২) রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৪৮% চাষি মহাজন এবং জমি মালিকদের থেকে ঋণ নিয়েছেন, এবং প্রায়শই মাত্রাতিরিক্ত সুদের হারে – সাম্প্রতিক কালে দেশ জুড়ে কৃষক আত্মহত্যার খবরগুলির প্রেক্ষাপট কিন্তু এটাই।

সরকারি ব্যাংক ব্যবস্থা কিছু বেশিই কেলেঙ্কারি-প্রবণ বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের বেসরকারি বেরাদররা খুব একটা পিছিয়ে নেই । কাজেই, সরকারি ক্ষেত্রে অকর্মণ্যতা এবং দুর্নীতির অভিযোগ তথা সরকারি ব্যাংকগুলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় 'দে গরুর গা ধুইয়ে'র মত 'বেসরকারিকরণ চাই' বলে দিলেই সব সমস্যা মিটে যায় না; উপরে বর্ণিত বিষয়গুলিও মাথায় রাখা প্রয়োজন। এর পিছনে যে গভীরতর কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলো আমাদের বুঝতে হবে।

ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘিরে এই বিতর্কটিতে সাবেক খোলা বাজার বনাম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিতর্কটার একটা ছায়া আছে যা ৯০ দশকের শুরুর দিকে ভারতের সব অর্থনীতির কলেজ পড়ুয়ার অবশ্যপাঠ্য ছিল; পাশাপাশিই ছিল সেই বহুচেনা ভাষ্য যে আমাদের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি আসলে উপরোক্ত দুই ব্যবস্থার ভালো দিকগুলিরই সংমিশ্রণ।

'মিশ্র' জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বোধহয় একটা খুবই ভারতীয় ব্যাপার – আমাদের হোটেল-রেস্তোরাঁর মেনু বা বাড়ির খিচুড়ির মত সর্বজনপ্রিয় পদগুলির কথা মনে করে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। এটা হয়তো আমাদের নিহিত 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' বা সমন্বয়ী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে আরেকটু সাধারণ ভাবে বললে, সম্পদের দোষগুণের দিক থেকে 'মিশ্র' শব্দটা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক; মিশ্র বলতে সাধারণত বোঝায় সুসমঞ্জস, যা সবক্ষেত্রেই কম ঝুঁকিপূর্ণ।

ভারতের এই মিশ্র অর্থনীতিকে পথ দেখাতো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি। প্ল্যানিং কমিশন এবং বিবিধ মন্ত্রকগুলির মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতির উপর কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত; বেসরকারি ক্ষেত্রকে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু সরকারি ক্ষেত্রের বশংবদ অধস্তন হিসেবেই। ছাত্র হিসেবে আমাদের ধারণা ছিল, "প্ল্যানিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কীই বা থাকতে পারে?" কারণ পরিকল্পনা করে চলা তো শ্রেয় (বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে), সে জীবনের সব ক্ষেত্রেই।

সে সব সুখের দিন ছিল।

পরবর্তী দশকগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অর্থনীতিগুলিতে একের পর এক ধস নামল; ৭০ দশকের শেষ দিকে যৌথ খামারগুলি বেসরকারিকরণের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ার শুরু, সেই পথে ক্রমশ আরও বাজার-কেন্দ্রিক একটি অর্থনীতির দিকে হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখল চিন; ৯০ দশকের উষাকালে মুক্ত অর্থনীতির জন্য দরজা খুলে দিল ভারতও, আর সেই সঙ্গেই সরে এল পুরোনো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক মডেলটিকে যাকে ব্যঙ্গ করে 'পোস্ট অফিস সমাজতন্ত্র' বলে ডাকা হত এককালে; ডাক ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, বৈচিত্র, ও উদ্যমের অভাবের সঙ্গে সে সময়কার ভারতীয় অর্থনীতির চলনের একটা ভালোরকম সাদৃশ্য ছিল কিনা!

এই পরিবর্তনের হাওয়ায় কবে যেন একটা 'পরিকল্পনা' আর 'মিশ্র অর্থনীতি'র মত শব্দবন্ধগুলো অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। পিছন ফিরলে বোঝা যায়, 'মিশ্র' মানেই যে দু'দিকের সব ভালোগুলো একত্রিত হবে তা তো নয়! সেই প্রচলিত রসিকতাটির মত – মা-বাবার কেউ একজন সুন্দর আর একজন বুদ্ধিমান হলে, তাঁদের সন্তান সুন্দর ও বুদ্ধিমান না হয়ে উল্টোটাও তো হতে পারে!

কিছু সরকারি ব্যাংক এবং কিছু বেসরকারি – এই মিশেলটা ছাড়া গত্যন্তর নেই ঠিকই। এখন প্রশ্নটা হল, সবচেয়ে সুষম অনুপাতটা কী হওয়া প্রয়োজন, এবং সেটায় পৌঁছনোই বা যাবে কী করে?

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ, কোনও একটা প্রতিষ্ঠানকে – এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে – যদি গোটা অর্থনীতির জন্য পরিকল্পনা করতে হয় তবে সেই ব্যবস্থা কার্যকরী ভাবে চালানোর জন্য তাকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং ত্রিকালদর্শী হতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পকের হাতে যদি সেই পরিমাণ ক্ষমতা থাকে, তাহলে ভরসা কি যে সেই ক্ষমতা সবসময় সব পরিস্থিতিতে সমাজের কল্যাণার্থেই ব্যবহার করা হবে ? যে মুহূর্তে আমার হাতে যা খুশি তাই করার গাজোয়ারি ক্ষমতা চলে আসছে, আমার কিন্তু সৎপথে থেকে সেই ক্ষমতাকে দেশের ও দশের মঙ্গলে ব্যবহার করে আদতে কোনও লাভ নেই, কারণ নিজের গদি টিঁকিয়ে রাখতে তখন আমার আর কাউকে খুশি করার প্রয়োজন নেই, বরং বাকি সবকিছু ছেড়ে নিজের লাভক্ষতিটা বুঝে নেওয়ার অবশ্য প্রয়োজন আছে। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ কথাটি তো আর এমনি এমনি আসেনি।

কাজেই কেন্দ্রীয় অর্থনীতিগুলি যে একটা সময়ে ধসে পড়েছিল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দেশের জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত তৈরিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। তার উপর, যেহেতু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিকে কার্যকর রাখতে হলে একটা পরিমাণ গাজোয়ারি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, এই সবগুলো দেশেরই রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি কার্যত একনায়কতন্ত্র হয়ে উঠেছিল (এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও তাই আছে)।

ভারতের সরকারি ব্যাংক (বা বৃহত্তর অর্থে গোটা সরকারি ক্ষেত্র) বললেই সাধারণত যে সমস্যাগুলির কথা ওঠে, সেগুলি সবই কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থনীতির সমস্যা। যেমন, তথ্য আদানপ্রদানের সমস্যা – যা থেকে আমলাতান্ত্রিক লালফিতের ফাঁস আর দীর্ঘসূত্রিতার উৎপত্তি। যেমন সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রবণতা – আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্যই যদি করদাতার টাকায় আমায় ভর্তুকি দেওয়া হতে থাকে, তাহলে আমি ক্ষতি এড়ানোর জন্য আলাদা করে কোনও উদ্যোগই বা নিতে যাব কেন? সর্বোপরি রয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সমস্যা – ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপর যদি সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে তো স্বজনপোষণের সমস্যা তৈরি হবেই।

কেন্দ্রীয় অর্থনীতি যদি কার্যকর না-ই হয়, এবং সেই কারণেই সরকারি ক্ষেত্রের কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থেকে থাকে, তাহলে আমাদের কি একটা বিশুদ্ধ বাজারভিত্তিক অর্থনীতির দিকেই এগোনো উচিত নয়? এই উদারীকরণ এবং সংস্কারের চেতনাটাকে বাস্তবায়িত করার জন্যই কি নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হয়নি?

সমস্যাটা হল, বিশুদ্ধ বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা কোথাওই নেই, এবং সঙ্গত কারণেই নেই। এমনকি তথাকথিত ভাবে পাশ্চাত্য বিশ্বের সবচেয়ে 'মুক্ত অর্থনীতি'র দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু প্রাদেশিক, স্থানীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে সরকারের ব্যয় জাতীয় আয়ের প্রায় ৩৬.১%।

বিশুদ্ধ বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা বাস্তবে কাজ না করার একাধিক কারণ আছে।

যথাযথ বিধিনিষেধ এবং আইনের শাসন ছাড়া, গরিব এবং নিরক্ষরদের শোষণ করা, শ্রমিক ও উপভোক্তাদের ঠকানো বা পরিবেশ ধ্বংস করার থেকে বাজারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে আটকানো সম্ভব নয়। বাজারের নিজস্ব ওঠানামার উপর ছেড়ে দিলে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত অত্যাবশ্যক সার্বজনীন পরিষেবাগুলি যথাযথ ভাবে সবার কাছে পৌঁছবেই না; ক্ষীর খাবে শুধু ধনীরা, যারা কার্যত দেশের অর্থনীতিটাকে নিজেদের জমিদারী বানিয়ে ফেলবে।

এ কথা মোটের উপর সর্বজনস্বীকৃত যে বাজার অর্থনীতিগুলি তাদের নিজস্ব চরিত্রবলেই অসাম্য সৃষ্টি করে, যে অসাম্য দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিতে অস্থিরতার জন্ম দেয়। কোনও অর্থনীতির প্রেক্ষিতেই, দেওয়ালে যাদের পিঠ ঠেকে গেছে তাদের মরিয়া ক্ষোভের চেয়ে বড় ধ্বংসাত্মক শক্তি আর কিছুই নয় – সে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যদি মহারাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ কৃষকদের মুম্বই অভিযানের মত শান্তিপূর্ণ হয় তা হলেও। জনসংখ্যার বড় অংশ ক্ষেপে গিয়ে যাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ওলটপালট না করে দেয়, তা নিশ্চিত করার জন্যই অর্থনৈতিক ভাবে দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য সামাজিক সুরক্ষাকবচ তৈরি করার প্রয়োজন আছে সরকারের তরফে। দীনদরিদ্রের দুঃখে প্রাণ যদি বা নাই কাঁদে, শুকনো বাস্তববুদ্ধিই এই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট সওয়াল।

এ তো গেল সাধারণ কিছু অপকারিতা। এছাড়াও, একাধিক কারণে নির্দিষ্ট ভাবে লেনদেনের বাজারগুলি বাজার অর্থনীতির একটা অন্যতম অসুরক্ষিত অংশ।

প্রথমত, আর্থিক বাজারে আয় নির্ভর করে ভবিষ্যত প্রত্যাশার উপর – যে বিষয়টাকে কথ্য ভাষায় 'বাজারের মেজাজ' বলে উল্লেখ করা হয় – যা প্রকৃতিগত ভাবেই অনিশ্চিত এবং বিনিয়োগকারীদের মেজাজ মর্জির ওঠাপড়ার উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক ভাবেই আর্থিক লেনদেনের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি, এবং এই অনিশ্চয়তার কারণে স্রেফ ফাটকা খেলার ভিত্তিতে কখনও প্রবল উঁচুতে আবার কখনও গভীর অতলে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। এ দিকে ব্যাংক নামক প্রতিষ্ঠানটি 'এতই বিপুল যে একে তলিয়ে যেতে দেওয়া যায় না' যেহেতু সেই ধাক্কায় গোটা অর্থনীতি টালমাটাল হওয়ার আশঙ্কা আছে; আর সেই কারণেই এই ক্ষেত্রে সরকারের উপস্থিতি চাইলেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক বাজারের লেনদেন অন্য ধরণের লেনদেনের থেকে মূলগত ভাবেই আলাদা। আপনি এক কিলো আলু কিনলেন কী সেলুনে চুল কাটালেন; এতে কোনও একটি পণ্য বা পরিষেবার ভিত্তিতে অর্থের হাতবদল হল। কিন্তু আর্থিক লেনদেনে একটা বাস্তব জিনিসের (অর্থাৎ টাকা) হাতবদল হচ্ছে শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে – ধরা যাক, ঋণ শোধ করা বা লভ্যাংশ দেওয়ার – আর প্রতিশ্রুতি জিনিসটা প্রকৃতিগত ভাবেই ভঙ্গুর এবং অনির্ভরযোগ্য।

তৃতীয়ত, আর্থিক স্বত্ব বিষয়টা কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে জড়িত। যেমন, আন্তর্ব্যাংক বাজারে ব্যাংকগুলি পরস্পরকে ঋণ দিয়ে থাকে, ফলে একটি ব্যাংক দেউলিয়া হলে এই পারস্পরিক নির্ভরতার কারণে অন্য সবক'টি ব্যাংকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর উপর যদি আমানতকারীরা ভয় পেয়ে গিয়ে গণ হারে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আমানত তুলে নিতে থাকেন তাহলে একটি ব্যাংকের সঙ্কট পর পর সব ব্যাংকগুলিতে থাবা বসিয়ে গোটা দেশের অর্থনীতিকেই সঙ্কটের মুখে ফেলে দিতে পারে।

আরেক ভাবে বললে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতর অর্থের চলাচলকে অনেকটা মানুষের শরীরে রক্ত চলাচলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে; দেহের কোনও একটা অংশে সংক্রমণ হলে তা গোটা শরীরে ছড়িয়ে যেতে সময় লাগে না। ঠিক এই কারণেই ভারতে তথা সারা বিশ্বে (২০০৮ আর্থিক মন্দার সময় যেমন দেখা গিয়েছিল)

সরকার করদাতাদের টাকা ব্যবহার করে দেউলিয়া হতে বসা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে টেনে তোলার চেষ্টা করে। ব্যাংকগুলি যদি লোভে পড়ে আজেবাজে ঝুঁকি নিয়ে থেকে থাকে বা অসৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমানতকারীদের অর্থ নয়ছয় করায় অপরাধীও হয়; তাহলেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। তারা 'এতই বড়ো যে ডুবতে দেওয়া যায় না'; নাহলে গোটা অর্থব্যবস্থাই ধসে পড়ার আশঙ্কা আছে।

কাজেই বেসরকারিকরণ করে ব্যাংকের রোজকার কাজকর্মে সরকারের হস্তক্ষেপ কমানো সম্ভব বটে, কিন্তু সরকারের উপস্থিতি একেবারে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার যৌথ, কিন্তু মুনাফার মালিকানা একক, এমনটা তো আর হয় না!

যেটা করণীয় তা হল, বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে লভ্যাংশের (ইকুইটির) সরকারি মালিকানার একটা ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসেবে সেগুলির ব্যবস্থাপনার উপর সরকারের কিছুটা অন্তত নিয়ন্ত্রণ থাকবে, এবং তার পাশাপাশিই ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজকর্মে মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, এবং আমলাদের নাক গলানো আটকানোরও ব্যবস্থা হবে। এর সঙ্গে দরকার একটা মজবুত প্রশাসনিক এবং নজরদারি ব্যবস্থাও; বড়সড় সঙ্কট এলে সরকার ঠিকই বাঁচিয়ে নেবে এরকম মানসিকতা থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের যে ঘাটতিটা দেখা যায় তাতে কিছুটা হলেও রাশ টানতে পারবে যা।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বনাম বাজার অর্থনীতির বিতর্কটা সেকেলে বটে, কিন্তু এই সরকারিকরণ বনাম বেসরকারিকরণের বিতর্কটাও টেনে নিয়ে যাওয়া প্রায় একই রকম অর্থহীন। বাজার এবং সরকারের, তথা সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকের একটা মিশ্র ব্যবস্থাই একমাত্র কার্যকরী বিকল্প। প্রশ্নটা হল, এর সঠিক অনুপাতটা কী, এবং সেটায় পৌঁছনোই বা যাবে কী ভাবে?

এত ভাগ সরকারি হস্তক্ষেপ আর এত ভাগ খোলা বাজার – এরকম কোনও ম্যাজিক ফর্মুলা নেই। বস্তুত, এমন একটা ফর্মুলার খোঁজ করাটাই সমস্যাজনক, কারণ সেটা ঘুরেফিরে আবার সেই একটা কেন্দ্রীয় হর্তাকর্তার মানসিকতাতেই বেঁধে ফেলছে আমাদের।

কোটি কোটি অর্থনৈতিক এককের বিচরণক্ষেত্র আজকের এই ক্রমশ পরিবর্তনশীল এবং জটিল পৃথিবী; এখানে কাঙ্খিত পরিণামের জন্য পরিকল্পনা করে লাভ নেই, সে জায়গায় সব সময়েই একটা পরিমাণ অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। যেটা নিশ্চিত করা আমাদের হাতে আছে, তা হল কাঙ্খিত পদ্ধতি কী হবে। তাতে করে ভাগ্য সহায় হোক বা বিরূপ, মোটের উপর সঠিক পথেই থাকা যাবে। উপমায় বলা যাক: ধরুন সারা বছরে আমরা ঠিক কী কী খাবো তা আগে থেকে তো কোনও মতেই ঠিক করে রাখা সম্ভব নয়। বাজারে কোন সময় কী পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের কেনার সাম্যর্থ কতটা থাকছে, আর কখন কোনটা খেতে ইচ্ছে করছে বা করছে না, এমন হাজারটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই চাহিদা বদলে বদলে যায়। কিন্তু শরীর এবং পকেট দুইই সুস্থ এবং সন্তুষ্ট থাকে যাতে, সেরকম কিছু সাধারণ খাওয়াদাওয়ার নিয়মকানুন এবং তার জন্য একটা বাজেট কিন্তু আমরা আগে থেকে ঠিক করে নিতেই পারি।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা তথা সব রকম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংস্কারেরই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ নিয়মকানুন তৈরি করা যা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে, এবং রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের ক্ষমতা ফলানোর সুযোগ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। পি জে নায়েকের নেতৃত্বে ভারতের ব্যাংক বোর্ডগুলির পরিচালন পর্যালোচনা কমিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছিল সেগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার প্রয়োজন আছে এই কারণেই। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপস্থিতি যে সব এলাকায় বিশেষ নেই সেখানে সরকারি ব্যাংক ঋণে অগ্রাধিকার কাদের এবং কী ভাবে হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট নীতি সরকারের তরফে তৈরি করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তা বাদে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারের ছোট থেকে বড় সমস্ত হস্তক্ষেপে রাশ টানার নীতিই আমাদের নেওয়া উচিত। সরকারি ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে যে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি এবং অকর্মণ্যতার অভিযোগ সে সব এই ফাঁক দিয়েই ঢোকে। তবে কিনা এই হস্তক্ষেপগুলিই তো সরকারকে নিজের ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করে, ফলে নিজে থেকে এই অভ্যাস বদলাবে বলে মনে হয় না।

৬

আসলে মুখে নেহরুতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেকেলে জগদ্দল ব্যবস্থাটাকে উলটে নীচু তলা থেকে উঠে আসা স্বরকেই তুলে ধরার কথা বললেও মোদীর কর্মপন্থা কার্যত সেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার স্বৈর শাসকের মতই; যিনি প্রশাসনের জোর খাটিয়ে সব কিছু সামরিক কায়দায় নিয়ন্ত্রণ করতে চান। শুধু ব্যাংক ব্যবস্থা নয়, আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা নিয়ে জোর-জবরদস্তি , জমি অধিগ্রহণ বিল থমকে যাওয়া, নোটবন্দী রূপায়ণে চূড়ান্ত অপরিমাণদর্শিতা এবং বিশৃঙ্খলা, এমনকি বর্তমানে আলোচনার পর্যায়ে থাকা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সংস্কারগুলির সর্বাঙ্গেও এই স্বৈরতান্ত্রিকতার ছাপ স্পষ্ট। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই – সামাজিক ও রাজনৈতিক সবস্তরে স্বৈরাচারী আচরণের ছাপ এতই স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্যের জোয়ার আসবে তা আশা করা যায়না ।

প্ল্যানিং কমিশন আজ মৃত বটে, কিন্তু এই কেন্দ্রীয় ভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের মনোভাব – অর্থনৈতিক কাঠামোর চূড়ায় বসে সবকিছুর বরাদ্দ ঘোষণা করা এবং তারপর রাষ্ট্রের পেশির জোর খাটিয়ে যেন তেন প্রকারে তা বলবৎ করা – সেই ট্র্যাডিশন কিন্তু বহাল তবিয়তে বর্তমান। কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে লাইসেন্স-কন্ট্রোল রাজের কিছু অবাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ ঝেড়ে ফেলতে এই কঠোরতার সত্যিই প্রয়োজন ছিল, সেখানে মোদী সরকার কোনও রকমের রাজনৈতিক সদিচ্ছা আদৌ দেখাতে পারেনি; কমিশনের নাম পালটে নীতি আয়োগ করে একটা প্রতীকি পদক্ষেপ রেখেছে শুধু।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে জল, হাওয়া এবং খাদ্য-পানীয়র মত আমাদের অর্থনৈতিক নীতিও চিরকাল ভেজাল ও দূষণেই ভরে থাকলো । বিশুদ্ধ বামপন্থী বা বিশুদ্ধ দক্ষিণপন্থী নীতি কোনটাই ঠিক করে রূপায়িত হলনা। দুটোরই সমস্যা আছে, কিন্তু তার বদলে মিশ্র অর্থনীতি বা উদারীকরণের নামে যা পেলাম তা হলো দুই ব্যবস্থার সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো – সরকারী নিয়ন্ত্রণের সামাজিক সুরক্ষার বদলে রাষ্ট্রের চোখ রাঙানি আর কালান্তক লালফিতে, আর বাজার অর্থনীতির দক্ষতা আর উদ্যমশীলতার জোয়ারের বদলে বদ্ধ ডোবায় জোঁকের মত একচেটিয়া পুঁজির শোষণ ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা।

আচ্ছে দিন দূর অস্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ইংরেজিতে আমার লেখা প্রবন্ধের কিছু অংশ এই লেখাটিতে ব্যবহার হয়েছে, যা অনুবাদ করে দিয়েছেন দ্যুতি মুখোপাধ্যায় । মূল্যবান মন্তব্য দিয়ে সাহায্য করেছেন মনীষিতা দাশ ।

---

[1] এ নিয়ে সপ্তর্ষি রায়ের সাথে আমার লেখা "মোদী ম্যাজিক মূলত প্রচার, এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই" (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, মার্চ ২৫, ২০১৪) বা "Did Gujarat's Growth Rate Accelerate under Modi?" (*Economic and Political Weekly of India*, April 12, 2014) দ্রষ্টব্য।

[2] ২০১১ ও ২০১২ সালে বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস ছিল ৮.১% আর বাস্তবে সেই হার গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৬ এবং ৬.৭-এ। আইএমএফ তাদের ২০১৭ রিপোর্টে দেওয়া ২০১৮ সালের পূর্বাভাসটি ২০১৮ সালের রিপোর্টে এসে সংশোধন করেছে; ৭.৭ থেকে কমে এখন সেই হার ৭.৪%-এ দাঁড়িয়ে । সূত্র: https://www.imf.org/en/publications/weo.

[3] সূত্র: https://www.oxfamindia.org/pressrelease/2093.

[4] 'Indian Income Inequality, 1922-2014: From British Raj to Billionaire Raj?', সূত্র: https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/12409.html.

[5] এর মধ্যে আছে National Company Law Tribunal তৈরী করা আর Insolvency and Bankruptcy Companies Act পাশ করা।

[6] সূত্র: https://indianexpress.com/article/business/banking-and-finance/raghuram-rajan-over-optimistic-bankers-growth-slowdown-responsible-for-bad-loans/